# ধর্ম

বিভিন্ন জাতপাত এবং নৃগোষ্ঠী যখন একই ভাষায় কথা বলে, তখন তাদের বাকব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়, প্রভেদ সূচিত হয়। ভারতবর্ষে জাতপাতের ভিত্তিতে আলাদা বুলি আছে বলে পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করে থাকেন। আমেরিকার নিগ্রো নৃগোষ্ঠীর মধ্যে আলাদা একটি বুলি গড়ে উঠেছে। নৃগোষ্ঠীর মতো ধর্মের প্রভাব ভাষায় এত ব্যাপক না হলেও, তার প্রভাব ভাষায় বেশ কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের সঙ্গে ভাষা বৈচিত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই মেকলের (১৯৭৭) নাম করতে হয়। তিনি গ্লাসগোর উপভাষা-গবেষণায় খ্রিস্টান ধর্মের দুই সম্প্রদায়—ক্যাথলিক এবং অ-ক্যাথলিকদের মধ্যে বিভিন্ন ভেদরূপের সামান্য পার্থক্য লক্ষ করেন। তাঁর নমুনার এক চতুর্থাংশ ছিল ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক, ফলে তিনি তাঁর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, বাকি তথ্যজ্ঞাপকদের নমুনার সঙ্গে সহজেই তুলনা করতে পেরেছেন। তিনি গ্লাসগোর ইংরেজির পাঁচটি ভেদরূপ নিয়ে তাঁর গবেষণা-কার্য পরিচালনা করেছিলেন। এই পাঁচটি ভেদরূপ থেকে পার্থক্য প্রকট হলেও, তিনি বলেন এর থেকে কোনো প্যাটার্ন বেরিয়ে আসছে না। তিনি যে পাঁচটি ভেদরূপ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা হল: (i), (u), (au), (a), এবং (gs)। তিনি (i)-ভেদরূপের ৫টি, (u)-ভেদরূপের চারটি, (au)-ভেদরূপের চারটি, (a)-এর তিনটি, এবং (gs)-এর তিনটি পরিবর্তরূপ (variant) পেয়েছিলেন। মেকলে ধর্মের যে পার্থক্য দেখেছিলেন

Scanned with CamScanner

গ্লাসগো শহরের উপভাষায় তা সারণি ২.৭-এ সূচক অঙ্কের সাহায্যে দেওয়া হয়েছে। হিশেবে পাঁচটি ভেদরূপের বয়স, শ্রেণী ধরা হয়েছে।

পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে প্রাক্তন য়ুগোশ্লাভিয়ায় ধর্মের জন্য কীভাবে ভাষাব্যবহারে ভেদ দেখা দেয়। তিনি সারায়েভো শহরে ব্যবহৃত সার্বো-ক্রোএটদের ভাষা থেকে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। ট্রাডগিলের মতে এদের মধ্যেই গোষ্ঠীগত পার্থক্য থাকলেও; প্রভেদের মূলে কাজ করেছে ধর্ম। সার্বরা গোঁড়া খ্রিস্টান, ক্রোএটরা ক্যাথলিক। মুসলমানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দসমূহ বহু শতকের তুর্কি শাসনে ইসলাম প্রভাবের ফল (ট্রাডগিল ১৯৭৪খ:৬১-৬২)। তাঁর দেওয়া শব্দসমূহের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল:

| মুসলিম | ক্রোএট | সার্ব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| hlyeb | kruh | hlyeb | "রুটি" |
| voz | vlak | voz | "রেলগাড়ি, ট্রেন" |
| pendzer | prozor | prozor | "জানালা" |
| sevadah | lyubav | lyubav | "ভালোবাসা" |

রাজীব হুমায়ুন (১৯৯৩) বাঙলা ভাষায় হিন্দু-মুসলমান প্রভেদের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে কথিত মান্য বাঙলা ভাষা (এবং ক্ষেত্রবিশেষে সন্দ্বীপের উপভাষা) থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন: "সচেতন অথবা অসচেতন যেভাবেই হোক না কেন, এ দুই ধর্মাবিলম্বীদের ভাষা-ব্যবহারে কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে। সাধারণত ধর্মীয় শব্দ, স্বজনসূচক শব্দ, এবং নাম রাখার শব্দের ব্যবহারে ঐ বৈচিত্র্য দেখা যায়। হিন্দু ব্যবহৃত স্বজনসূচক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য শব্দের উৎস মূলত সংস্কৃত, পক্ষান্তরে মুসলমান ব্যবহৃত শব্দের উৎস মূলত আরবী-ফার্সী। বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ এবং প্রত্যয়-বিভক্তি নির্বাচনেও বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।" (হুমায়ুন ১৯৯৩: ৬৭)

*ধর্মীয় শব্দ*

| মুসলমান ব্যবহৃত | হিন্দু ব্যবহৃত | অর্থ (= ধারণা) |
|---|---|---|
| আল্লাহ্/খোদা | ঈশ্বর/ভগবান | "স্রষ্টা" |
| নামাজ | উপাসনা/প্রার্থনা | "প্রার্থনা" |
| বেহেশ্‌ত | স্বর্গ | "পরকালের সুখের আবাস" |
| দোজখ | নরক | "পরকালের শাস্তির আবাস" |
| ফেরেশ্‌তা | দেবতা | "স্রষ্টার অশরীরী প্রতিনিধি" |
| রোজা | উপবাস | "খাদ্যগ্রহণে বিরতি" |

*আত্মীয়তাসূচক শব্দ*

| মুসলমান ব্যবহৃত | হিন্দু ব্যবহৃত | অর্থ |
|---|---|---|
| আব্বা | বাবা | "পিতা" |
| আম্মা | মা | "মাতা" |
| চাচা, কাকা | কাকা/খুড়ো | "পিতার (বয়ঃকনিষ্ঠ) ভাই" |
| খালা | মাসি | "মাতার ভগিনী" |
| ফুফু | পিসি | "পিতার ভগিনী" |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| আপা/বুবু | দিদি | "নিজের বোন (বড়ো)" |
| নানা | দাদু | "মাতার পিতা" |
| নানি | দিদিমা | "মাতার মাতা" |
| ভাবি | বৌদি | "(বয়োজ্যেষ্ঠ) ভাই-এর বৌ" |

তিনি বলেন মুসলমানদের মধ্যে *মা, বাবা, দিদি*-র ব্যবহার তথা চল থাকলেও, হিন্দুরা কদাপি *আব্বা, ফুফু, আপা* ব্যবহার করে না। তিনি আরো বলেন (হুমায়ুন ১৯৯৩: ৬৮) *ভাবি বৌদি*-র ব্যবহারে একটু ভিন্নতা দেখা যায়। সম্ভাষিতা হিন্দু বন্ধুর স্ত্রী হলে, সম্ভাষক মুসলমান, হিন্দু ব্যবহৃত *বৌদি* ব্যবহার করে, কিন্তু সম্ভাষিতা মুসলমান হলে, কোনো হিন্দু সম্ভাষক কখনো সম্ভাষিতাকে *ভাবি* বলে না।

*নামকরণ*

সাধারণত প্রতিটি বাঙালির ডাক নাম এবং পোশাকি নাম থাকে। তাঁর মতে (হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩৬) হিন্দু এবং মুসলমানদের নাম সাধারণত ধর্মভিত্তিক হয়ে থাকে। হিন্দু নাম মূলত সংস্কৃত উৎসজাত, মুসলমান নাম আহৃত হয় আরবি-ফারশি ভাষা থেকে, যেমন *মোহাম্মদ আবদুল করিম* (মু), *কনক কর্মকার* (হি)। আরবি-ফারশি প্রভাবিত মুসলমান নামের আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে "মোহাম্মদ থাকে"। সংস্কৃত-প্রভাবিত হিন্দু নামের আগে থাকে *শ্রী*। তিনি বলেন, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও মুসলমানেরা নামের আগে *শ্রী* ব্যবহার করত। বর্তমানে তারা *শ্রী* ব্যবহার করে না। তারা ব্যবহার করে জনাব। হিন্দুদের নামের শেষে থাকে বর্ণদ্যোতক পদবি (বা উপাধি)। মুসলমানদের নামের শেষে অথবা প্রথমে *সৈয়দ, খান,* ইত্যাদি দেখা যায়। কিছু কিছু পদবি (যা ছিল এককালে "উপাধি" বা "title") তা উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে থাকে যেমন *চৌধুরী (সরকার, নস্কর* ইত্যাদি)।

বাংলাদেশে মুসলমানদের নামকরণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেউ কেউ পুরো আরবি-ফারশি নামের বদলে বাঙলা তথা সংস্কৃতের সঙ্গে সমঝোতা করে থাকে, যেমন *সুবর্ণা মোস্তাফা, আনন্দ জামাল, প্রতীক হোসেন,* ইত্যাদি।

*সম্বোধন, প্রত্যুত্তর, অভিবাদনসূচক শব্দ*

কিছু কিছু সম্বোধনসূচক শব্দ, প্রত্যুত্তরদান মূলক শব্দ, অভিবাদনমূলক শব্দ দুই সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে। সম্ভাষক এবং সম্ভাষিতের ওপর নির্ভর করে এসব শব্দের ব্যবহার। যেমন:

| সম্ভাষক | সম্ভাষিত | নামের শেষে ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|
| মুসলমান<br>হিন্দু | মুসলমান | সাব/সাহেব (যেমন, 'রফিক সাব',<br>মিয়া (যেমন, 'করিম মিয়া') |
| মুসলমান<br>হিন্দু | হিন্দু | বাবু (যেমন, 'সতীশবাবু') |

ব্যক্তি যদি হিন্দু হয়, নামের সঙ্গে কখনো *সাব/সাহেব* হবে না। ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, নামে তৎসম বা বাঙলা শব্দ থাকলেও তা *সাব/সাহেব* হবে (যেমন *রাজীব সাহেব,* কারণ তিনি আসলে *রাজীব হুমায়ুন,* ধর্মে মুসলমান, তিনি ধর্মে বিশ্বাস করুন আর না করুন।)

Scanned with CamScanner

প্রত্যুত্তরে দু ধরনের শব্দ পাওয়া যায়, *কি*, এবং *জি* (zi) *কি* হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে সম্ভাষক কম বয়সের অথবা সম্মানের হলে সম্ভাষিত প্রত্যুত্তরে *কি* ব্যবহার করে থাকে। সম্ভাষক যদি সম্মানীয় ব্যক্তি হন, তিনি হিন্দু হলে সম্ভাষিত প্রত্যুত্তর হিন্দুদের মধ্যে *আজ্ঞে* ব্যবহার করবে, মুসলমান হলে *জি* (zi) ব্যবহার করবে।

অভিবাদসূচক শব্দেও হিন্দু-মুসলিম ভেদ আছে। হিন্দুরা হিন্দুদের মধ্যে *নমস্কার* বলে থাকে। মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে *আস্‌সালাম আলাইকুম*। *আদাব* শব্দ উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে থাকে।

*নৈকট্যসূচক বিভক্তি*

সম্মান এবং আদর প্রদর্শনের জন্য বাঙলায় কিছু 'বিভক্তি' (?) (=শব্দ) আছে যা উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে থাকে। মুসলমানেরা ব্যবহার করে *জান* (যেমন, *আব্বাজান*), *জি* *(আব্বাজি)*। আবার হিন্দুরা ব্যবহার করে, *মনি* (যেমন, *মামনি*), *বাবু (কাকাবাবু)* ইত্যাদি।

রকি মিরান্ডা (১৯৭৮) কোঙ্কনি ভাষার ক্ষেত্রেও হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করেছেন।

Scanned with CamScanner

ভাষার ভিন্নতা, অঞ্চলের ব্যবধান হলে হয়, পরিস্থিতির তফাত ঘটলে হয়, বিভিন্ন রকমের সামাজিক শ্রেণীর জন্যও ভাষায় বা বুলিতে তারতম্য হয়। এসবগুলোই আধুনিক ভাষানুসন্ধানে ভেদরূপ (variable) বলা হয়। এরকম আরেকটি ভেদরূপ (variable) আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে, তা লিঙ্গ (sex)। লিঙ্গেরও যে ভাষার বা বুলির ওপর প্রভাব আছে তা লেবোভ, ট্রাডগিল প্রমুখ যাঁরা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা-ভিন্নতা বিষয়ে সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে চর্চা করেছেন তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। একই সামাজিক শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে বেশ তফাত দেখা যায়। নারীর ভাষা-ব্যবহারে একান্তই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পুরুষের ভাষায় থাকে না। তাই বলে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে নারীর একেবারে আলাদা কোনো ভাষা বা বুলি ব্যবহার করে। ১৯১৫ সালে তাঁর 'অস্বাভাবিক ভাষা' (abnormal language) বিষয়ক প্রবন্ধে স্যাপির (১৯৬৮) নারীর ভাষাকে 'অস্বাভাবিক' বলে অভিহিত করেছেন।

নারী-পুরুষের ভাষায় যে তারতম্য তা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। এর প্রাচীনতম উদাহরণ পাই সংস্কৃত নাটকে। সংস্কৃত নাটকে পুরুষেরা এক উপভাষায় কথা বলে, নারীরা বলে অন্য এক উপভাষায়। ভাষায় যে তারতম্য বা ভিন্নতা ঘটে তার একটি কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (social space বা social distance) যেমন উপভাষা, নিম্ন এবং উচ্চ সামাজিক শ্রেণীর বুলি। নারী-পুরুষের ভাষার তারতম্যকে সামাজিক দূরত্ব না বলে 'সামাজিক পার্থক্য' (social difference) বলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন ট্রাডগিল (১৯৭৪খ: ৯৫)। তাঁর মতে ভৌগোলিক, নৃগোষ্ঠীগত, সামাজিক শ্রেণীগত বুলি, অংশত সামাজিক দূরত্বের ফল, কিন্তু নারী-পুরুষের ভাষায় বিভিন্ন দিকে যে প্রভেদ দেখা দেয় তা সামাজিক পার্থক্য বা অসাম্যের প্রতিফলন। সমাজ পুরুষ-শাসিত বলে পুরুষেরা আধিপত্য (dominance) বজায় রাখতে বিভিন্ন রকমের সামাজিক ধর্ম বা গুণ (attributes), বিভিন্ন রকমের সামাজিক আচরণ নারী-পুরুষ থেকে আশা করে থাকে। ভাষায় লৈঙ্গিক প্রভেদ এই ঘটনার অর্থাৎ আধিপত্যের প্রতিফলন। তিনি স্কার্ট পরা নারীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাকে দেশীয় করলে এমন দাঁড়ায় যে পুরুষেরা যদি ধুতি না পরে, তা যেমন অদ্ভুত লাগবে, তেমনই পুরুষালি বাক ব্যবহারে নারীর বাক ব্যবহার বেমানান। ফলে পার্থক্যটা থাকতে বাধ্য। এই নিয়ে ট্রাডগিলের সঙ্গে স্পেন্ডার (১৯৮৫)-এর বিতর্ক হয়।

ভাষায় এই লিঙ্গ প্রভেদ নিয়ে সাম্প্রতিককালে খুবই পদ্ধতিগতভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে, এর অর্থ কোনোমতেই এই নয় যে আগে এই ব্যাপারটা কেউই লক্ষ করেন নি। অটো য়েসপেরসেন (১৯২২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'নারী ভাষা' নিয়ে তাঁর অধ্যায়ের নাম 'নারী' (The Woman)। এরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমাদেরই দেশে সারদাচরণ মিত্র (১৮৭২) তাঁর ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ক একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশের নারীর ভাষায় যে প্রভেদ আছে তা তিনি উল্লেখ করলেও বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। বস্তুত পূর্বে নৃতত্ত্ববিদ ও



Scanned with CamScanner

'উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা' বিষয়েও কাজ হয় (দাশ ১৯৭০)। এসমস্ত আলোচনায় ঔপভাষিক স্তরে নারীর আলাদা বুলির বিষয়ে আলোকপাত করা হয় সাম্প্রতিক কালে। বাংলাদেশের কথ্য বাঙলায় নারীর ভাষা ব্যবহার বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে (রাজীব হুমায়ুন ১৯৮১-১৯৮২), বাঙলায় কিছু কিছু শব্দ বা বাক্য আছে যা মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে এবং কখনো কখনো বিশেষ অর্থে তারা তা করে থাকে যেমন "অসভ্য, পাজি, দুষ্টু, কি চালাক, কি মিষ্টি, যা বলে কি, ভালো হবে না কিন্তু হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, আমার মরণ হয় না কেন" (হুমায়ুন ১৯৮০: ৪০-৪১) ইত্যাদি। অবধারণার্থক "না" শব্দটি মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে থাকে। যেমন: "আমি না আপনাকে না যখন দেখি তখন না চিনতেই পারি নি"। তিনি আরো জানান মেয়েরা একটু সুন্দর করে কথা বলে থাকে। তিনি আরো কিছু উদাহরণ দিয়েছেন যেমন যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারে পার্থক্য। বাংলাদেশের কথ্য (মান্য ভাষায় নয়) মেয়েরা বলবে: "বিয়ে বমু" (বিয়েতে বসব)। পুরুষেরা বলবে: "বিয়ে করমু" (বিয়ে করব)। ক্রিয়ার ব্যবহার থেকে বুঝতে পারছি পুরুষ-শাসিত সমাজে বিবাহ করাটা নারীর ইচ্ছাধীন নয়। কোনো বিবাহিতা নারীর পক্ষে, স্বামী বা স্বামীর দিক থেকে গুরুজনদের নাম নেওয়া এখনও তথাকথিত অশিক্ষিত তথা অন্-আলোকিত মহলে ট্যাবু হিশেবে বিবেচিত। [অতিশিক্ষিত তথা অভিজাত মহলের বিভিন্ন অবর সংস্কৃতিতে (subculture) স্বামীর নাম নেওয়া বা সেই নামে ডাকা আজ আর ট্যাবু বলে বিবেচিত হয় না। বরং নাম নেওয়াটাই আধুনিকতার পরিচায়ক।] সন্দ্বীপ অঞ্চলের নারীদের 'ভাষা' সম্পর্কিত আলোচনাটিও (হুমায়ুন ১৯৮৫) উল্লেখের দাবি রাখে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে সাম্প্রতিককালে সমাজভাষাবিজ্ঞানে অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধভাবে নারী পুরুষের ভাষার প্রভেদ আলোচনা করা হচ্ছে। তাতে পূর্ব প্রচলিত অনেক ধারণাই নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। যেমন, য়েসপেরসেনের মতে নারী-পুরুষের ভাষার প্রভেদ ট্যাবু-জনিত, তা-ও আগে যেমন দেখা যায় নি এখনও দেখা যাচ্ছে না; নারীরা বেশি পরিমাণে রক্ষণশীল এ তত্ত্ব যা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আর তেমন চলছে না। নারী-পুরুষের অসাম্যের জন্য ভাষার এই প্রভেদ এই যুক্তিও তেমন ধোপে টিকছে না, কারণ ভারতীয় সমাজে নারীপুরুষে অসাম্য বর্তমান, পশ্চিমী সমাজব্যবস্থায়ও অসাম্য রয়েছে, কিন্তু নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা সেখানে প্রবলভাবে বর্তমান। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে যে সাম্য আশা করা যায়, পশ্চিমের সমাজে সে সাম্য না থাকলেও, কিছুটা সমতাবাদী (egalitarian) সমাজব্যবস্থা রয়েছে সে কথা অস্বীকার করা উচিত হবে না। তবুও সেখানে শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে বলেই নারী-পুরুষের ভাষায় প্রভেদ বর্তমান। ট্রাডগিলের মতে এর কারণ (আমরা আগেই বলেছি) সামাজিক দূরত্ব বা ব্যবধান নয়, সামাজিক পার্থক্য (social difference)। প্রায় একই কথা বাঙালি পণ্ডিত ট্রাডগিলের বহু পূর্বে বলেছেন যে পুরুষ-নারীর মানস প্রকৃতি, শারীরবৃত্তি ও কর্মক্ষেত্র অনেকটা আলাদা বলেই এই পার্থক্য চলে এসেছে (সেন ১৯৫৬: ১)। সামাজিক শ্রেণীর যেমন সমাজোপভাষা গড়ে উঠেছে, আধুনিক সমাজেও নারীদেরও তেমনি সমাজোপভাষা হয়তো থাকবে।

Scanned with CamScanner

কিছু শব্দ আছে যেখানে পুরুষ-নারী ভেদাভেদ রয়েছে, প্রথমে ইংরেজির উদাহরণ (ব্রে. কি ১৯৭৫: ৮১) দেব, পরে বাঙলার।

Men bellow; women purr
Men yell; women scream (or squal)
Women fret; men get angry
Men have careers; women have jobs
Married women engage in ''home-making''
single women ''keep house''

বাঙলা থেকেও এরই কাছাকাছি কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

'লাস্যময়ী নারী', (পুরুষেরা কখনোই 'লাস্যময়' হয় না)
পুরুষেরা 'বিয়ে করে', মেয়েরা 'বিয়েতে বসে', মেয়েদের 'বিয়ে হয়'
নারীরা 'রাঁধুনি', পুরুষেরা 'পাচক' (বা 'ঠাকুর')
বিবাহিতা নারীরা 'ঘরকন্না করে', অবিবাহিতারা 'ঘরের কাজ করে', 'রান্নাও করে', কিন্তু 'ঘরকন্না করে' না
মহিলারা 'যৌবনবতী', (পুরুষদের বেলায় 'যৌবনবান' হয় না কখনো)

নারী-পুরুষের ভাষায় প্রভেদ বিষয়ে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে (যেমন লেবোভ (১৯৬৬), লেভিন এবং ক্রকেট (১৯৬৬), শুই এবং অন্যান্যরা (১৯৬৭), উলফর‍্যাম (১৯৬৯), ক্যাসোল্ড (১৯৬৮), ট্রাডগিল (১৯৭৪ক), মিলরয় (১৯৮০) ও চেশায়ার (১৯৮২)) সেই সব গবেষণা থেকে একটি উপাত্ত (hypothesis) উঠে এসেছে যে বয়স, শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণী ধরে নিলেও নারীরা যে সমস্ত রূপ ব্যবহার করে তা মান্য ভাষার কাছাকাছি বা পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাসূচক ভাষিক রূপ (ট্রাডগিল ১৯৮৩ক: ১৬১)। তাঁর মতে নারী পুরুষের যে প্রভেদ তা লিঙ্গপক্ষপাত-মূলক প্রবণতা (sex-preferential tendency), কোনো লিঙ্গভূত ব্যাপার নয় (ট্রাডগিল ১৯৮৩ক: ১৬২) অর্থাৎ কোনো বিশেষ লিঙ্গভুক্ত ব্যক্তির কোনো ভেদরূপের (variable) প্রতি প্রবণতা থাকতে পারে, তাই বলে সেই ভেদরূপ সেই লিঙ্গবিশেষের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। এই বিষয় ট্রাডগিলের গবেষণা কর্ম থেকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ট্রাডগিল নরিজের ভাষায় ঘটমান বর্তমানের (ng) ভেদরূপ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি সেই গবেষণায় এই সমাজভাষিক ভেদরূপের দুটো রূপভেদ পেয়েছেন, একটি মান্যরূপ [iŋ], এবং অপরটি [in~n] অর্থাৎ অপরটিতে কণ্ঠনাসিক্য ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না সেখানে হচ্ছে জিহ্বামূলীয় দন্ত্য ধ্বনি। লেবোভের মতো সূচক অঙ্কের দ্বারা তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গড় মান (average mean) নির্দেশ করেছেন। মান্য রূপের জন্য তিনি ধরেছেন ১, অর্থাৎ যতোবার একজন মান্যরূপ [iŋ] বলবে, সে পাবে ১, অ-মান্য রূপ [n]-এর জন্য ২, যতোবার এই রূপটা বলবে সে পাবে ২। তারপর যতোবার সে এরকম উচ্চারণ করছে তার যোগফল, মোট উচ্চারণের (শব্দের) সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। এখন যে গড় হল তার থেকে ১ বাদ দিয়ে ১০০ দিয়ে গুণ করা হলে, সূচক অঙ্ক পাওয়া যায়। এই হিশেবে যদি ০০০ আসে, তার মানে সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী সকল ক্ষেত্রে মান্যরূপ ব্যবহার করেছে। যদি ১০০ হয়, তাহলে অ-মান্য রূপ ব্যবহার করেছে প্রতিটি দৃষ্টান্তে বা শব্দে। নিচে পাঁচটি সামাজিক শ্রেণী এবং চারটি বিভিন্ন রীতিতে



Scanned with CamScanner